৮ই মে ২০১১

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৫
বাংলাদেশ

বিষয়: আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল) আইন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

আপনার সরকার ১৯৭১ সালে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বর্বরতম যেসব ঘটনা ঘটেছিল তার বিচার করার যে উদ্যোগ নিয়েছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তাকে স্বাগত জানাচ্ছে। এসব অপরাধের হোতাদের কৃতকর্মের জবাবদিহিতা করতে বাধ্য করার লড়্যে একটি সফল, ন্যায়ভিত্তিক এবং পড়্গপাতবিহীন বিচারপ্রক্রিয়া অনুষ্ঠানের প্রতি হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তার জোর সমর্থন ব্যক্ত করছে। এসব বর্বরতার শিকার যাঁরা হয়েছিলেন সুবিচার থেকে তাঁরা অনেক বছর বঞ্চিত হয়েছেন। এসব অপরাধের হোতাদের বিচারের ঁনত কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে অনেক বছর দেরি হয়ে গেছে ।

অতএব সরকার এসব অপরাধের বিচারকল্পে একটি বিশেষ আইনবিশেষজ্ঞ দলের নেতৃত্বে একাধিক বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জানতে পেরে আমরা আনন্দিত হয়েছি। সরকারের অনুরোধে জাতীয় সংসদ ২০১০ সালের ফেব্রম্নয়ারি মাসে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল) আইন ১৯৭৩-এর ব্যাপারে কিছু সংশোধনী আনার পদড়্যেপকেও আমরা স্বাগত জানিয়েছি। এসব সংশোধনীর মধ্যে রয়েছে ট্রাইব্যুনালে সামরিক বিচারকের পরিবর্তে বেসামরিক বিচারক নিয়োগের সিদ্ধান্ত এবং ট্রাইব্যুনালকে তার নিজস্ব বিচারিক কার্যক্রম সমাধার জন্য স্বাধীনতা প্রদান। ২০১০ সালের ১৫ই জুলাই ট্রাইব্যুনালের জন্য কার্যপ্রণালী অবলম্বন আরেকটি ইতিবাচক পদড়্যেপ যার বলে এই আদালতগুলো কর্মকা- শুরম্ন করতে পেরেছে।

তবে আমরা মনে করি সংশিস্নষ্ট আইন এবং বিধিগুলো আরো সংশোধন করা উচিত যাতে আন্ত্মর্জাতিক মানবাধিকার সংক্রান্ত্ম যেসব রড়্গাকবচের প্রতি বাংলাদেশ অঙ্গীকার করেছে সেগুলো, আন্ত্মর্জাতিক অপরাধ আইন এবং বাংলাদেশের সংবিধান মেনে যুদ্ধাপরাধের বিচার সম্পন্ন হয়। আন্ত্মর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩-এর খসড়া মূলত: সেসময়কার আন্ত্মর্জাতিক মানদ-ের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আন্ত্মর্জাতিক অপরাধ আইন এবং এর প্রয়োগে অনেক পরিবর্তন এসেছে। বেশ কয়েকটি আন্ত্মর্জাতিক আদালতে পরিচালিত বিচারের মাধ্যমে গুরম্নত্বপূর্ণ মানদ- সৃষ্টি হয়েছে, আইন ব্যবহারে তাৎপর্যপূর্ণ জ্ঞান যোগ হয়েছে এবং জটিল মামলা পরিচালনায় মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে। আন্ত্মর্জাতিক এসব আদালতের মধ্যে রয়েছে প্রাক্তন যুগোসস্নাভিয়া ও রোয়ান্ডার জন্য প্রতিষ্ঠিত দু'টি আন্ত্মর্জাতিক ফৌজদারী আদালত, সিয়েরা লিয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশেষ আদালত এবং আন্ত্মর্জাতিক ফৌজদারী আদালত বাংলাদেশ যার একটি রাষ্ট্রপড়্গ। এসব আদালত থেকে বেরিয়ে আসা অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার প্রতিফলন বাংলাদেশে আন্ত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল কর্তৃক যে বিচারকাজ পরিচালিত হচ্ছে সেখানে থাকা উচিত বলে আমরা মনে করি যাতে এ আদালতে আন্ত্মর্জাতিক মানদ- মেনে যে ন্যায়ভিত্তিক বিচার হচ্ছে তা নিশ্চিত করা যায়।

তাছাড়া আইসিটির কর্মকা-ের সমস্ত্ম দিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত্ম আন্ত্মর্জাতিক চুক্তি (আইসিসিপিআর)-এর সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। কেননা বাংলাদেশ এ চুক্তি স্বাড়্গর করেছে। আইসিসিপিআর-এ ন্যায়ভিত্তিক বিচার এবং অভিযুক্তের অধিকারের মৌলিক শর্তসমূহ অন্ত্মর্ভুক্ত হয়েছে।

আমাদের উদ্বেগ এখানে যে, আইসিটি আইন এবং বিধিগুলোয় আরো কিছু সংশোধনী আনা না হলে এটি ন্যায়বিচারের আন্ত্মর্জাতিক মানদ- মেটাতে ব্যর্থ হবে। এর ফলে বাংলাদেশে ও দেশের বাইরে এ বিচারের প্রতি আস্থার অভাব ঘটবে, আর তা থেকে লাভবান হবে আর কেউ নয়, কেবল একাত্তরে বর্বরতম অপরাধ সংঘটনকারীরা। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বিশ্বাস করে সংশিস্নষ্ট আইন ও বিধিসমূহে কিছু সহজ সংশোধনীর মাধ্যমে এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব।

এ লড়্গ্যে আমরা নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো করছি:

- *আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনের ৩(২) ধারায় উলিস্নখিত অপরাধের সংজ্ঞা আরো স্পষ্ট করার লড়্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা যাতে এসব সংজ্ঞা অপরাধ সংঘটনকালে দেশের অথবা আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরম্নদ্ধে অপরাধ এবং গণহত্যার যে সংজ্ঞা ছিল তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হয়।*
- *আইসিটির এখতিয়ারভুক্ত মামলাগুলো আন্তর্জাতিক মানদ- অনুযায়ী পরিচালনার লড়্যে সরকার এ আদালতের প্রসিকিউটর এবং বিচারকদের প্রয়োজনীয় প্রশিড়্গণের ব্যবস্থা করতে পারেন।*
- *আইসিটির ধারা ৬(৮) যার বলে ট্রাইব্যুনালের গঠন এবং এতে অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের নিয়োগ বিষয়ে যে কোনো চ্যালেঞ্জ নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেটি আইসিসিপিআর-এর অনুচ্ছেদ ১৪(১)-এর আলোকে সংশোধন করা প্রয়োজন।*
- *সংশিস্নষ্ট আইনটিতে যথাযথ প্রক্রিয়া বিষয়ে আসামীর অধিকার এমনভাবে নিশ্চিত করা উচিত যেন তা আইসিসিপিআর-এর অনুচ্ছেদ ১৪ এবং আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আদালত বিষয়ক রোম সংবিধির ৫৫ ও ৬৭ অনুচ্ছেদের প্রতিফলন ঘটায়।*
- *বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৭(ক) বাতিল করা যাতে সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসহ সকল সাংবিধানিক অধিকার আসামীর ড়্গেত্রেও রড়্গিত হয়।*
- *একটি 'বিবাদী কার্যালয়' প্রতিষ্ঠা যার মাধ্যমে 'সমান অস্ত্র' প্রয়োগের নীতি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।*
- *একটি সুবিন্যস্ত আত্রান্ত ব্যক্তি ও সাড়্গী সুরড়্গা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যা বিচার শুরম্ন হওয়ার আগেই বাস্তবায়ন করতে হবে। যাতে বিচার প্রক্রিয়ার আগে, চলাকালীন ও পরে তাঁরা নিরাপদে থাকতে পারেন।*

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোয় আমাদের উদ্বেগ ও সুপারিশ বিস্তারিত আকারে তুলে ধরেছি। এসব বিষয় আপনার গোচরে নিয়ে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বর্বর কর্মকা-ের হোতাদের যাতে উপযুক্ত ন্যায় বিচারের মুখোমুখি করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

আপনার সদ্বিবেচনার জন্য আমরা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমরা বিষয়টি আরো আলোচনার আশা রাখি এবং গুরম্নতর অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিরা যাতে বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মানদ- অনুযায়ী পরিচালিত বিচারের মুখোমুখি হতে পারে তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারকে সাগ্রহে সহযোগিতা করতে চাই।

আপনার বিশ্বস্ত্ম

ব্র্যাড অ্যাডামস
নির্বাহী পরিচালক
এশিয়া বিভাগ

অনুলিপি প্রেরিত হলো: *আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ*
পররাষ্ট্র মন্ত্রী, ডা. দিপু মণি
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সাহারা খাতুন
আন্ত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান, নিজামুল হক
আন্ত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল রেজিস্ট্রার, মোহাম্মদ শাহীনূর ইসলাম

নির্দিষ্ট সুপারিশ

১. অপরাধ

আন্ত্মর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনের ধারা-৩-এ আইনটির আওতায় প্রতিষ্ঠিত আদালতের এখতিয়ার সম্পর্কে বলা হয়েছে মানবতার বিরম্নদ্ধে অপরাধ, শান্ত্মির বিরম্নদ্ধে অপরাধ, গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, ১৯৪৯ সালে প্রণীত জেনেভা কনভেনশনে সশস্ত্র সংঘাত চলাকালীন অবশ্যপালনীয় যেসব মানবিক বিধি উলিস্নখিত হয়েছে তার কোনোটির লঙ্ঘন এবং আন্ত্মর্জাতিক আইনের আওতায় যে কোনো অপরাধের বিচার এ আদালত করতে পারবে। কিন্তু আইনটিতে এসব অপরাধ সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। আমরা আইনটিকে প্রয়োজনীয় সংস্কার করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি যার মাধ্যমে এতে যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরম্নদ্ধে অপরাধ এবং গণহত্যার সংজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে উলেস্নখ করা করা হবে এবং যা হবে এসব অপরাধ সংঘটনকালে দেশে ও আন্ত্মর্জতিক আইনে এগুলোর যে সংজ্ঞা ছিল তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এড়্গেত্রে আন্ত্মর্জাতিক ফৌজদারী আদালত (আইসিসি)-এর রোম সংবিধিতে যে 'অপরাধের উপাদান' (Elements of Crimes) নির্ধারণ করা হয়েছে তা মূল্যবান নির্দেশনা যোগাতে পারে তবে সেটি করতে হবে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে আন্ত্মর্জাতিক চুক্তি (আইসিসিপিআর)-এর অনুচ্ছেদ-১৫-এর আলোকে।[১] উলেস্নখ করা প্রয়োজন রোম সংবিধির 'অপরাধের উপাদান' প্রণয়নের অন্যতম প্রধান ভিত্তি আন্ত্মর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত

বিভিন্ন যুদ্ধাপরাধ মামলার বিচারিক প্রক্রিয়া ও রায় সংক্রান্ত মামলা-আইন এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘোষণা, চুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে নিবিড় গবেষণা।

২. *বিচারক*

আমরা জেনে আনন্দিত হয়েছি যে জুলাই ২০১০-এ আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনের ধারা ৬(২) যেখানে উলেস্নখ করা হয়েছিল যে, সাধারণ সামরিক আদালতের বিচারক হওয়ার যোগ্যতা রাখেন এমন ব্যক্তিকে ট্রাইবুনালের সভাপতি বা বিচারক নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে, সেটি তুলে দেওয়া হয়েছে। এড়েত্রে আনীত সংশোধনী অনুযায়ী একজন বিচারক, বিচারক হওয়ার যোগ্যতা রাখেন এমন ব্যক্তি অথবা বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের বিচারক ছিলেন এমন ব্যক্তিকে ট্রাইবুনালে নিয়োগ দেওয়া যাবে। এ সংশোধনী একটি গুরম্নত্বপূর্ণ ইতিবাচক পদড়েপ। এ সংশোধনীতে আন্তর্জাতিক আইনের বর্তমান প্রয়োগের প্রতিফলন ঘটেছে: এ ধরনের ট্রাইব্যুনালে এখন শুধুমাত্র যোগ্য বেসামরিক বিচারকরা নিয়োগ পান।

কোনো বিচারক এমন কোনো মামলার বিচারিক ভার গ্রহণ করবেন না যেখানে তাঁর নিরপেড়্গতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। আমরা এড়েত্রে আইসিটি-এর ধারা ৬(৮) সম্পর্কে উদ্বিগ্ন কারণ এটি ট্রাইব্যুনালের গঠন, এর সভাপতি অথবা অন্যান্য সদস্য বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের এখতিয়ার নাকচ করে দিয়েছে। এ ধারাটির সংশোধন করা উচিত, যাতে তা আইসিসিপিআর-এর অনুচ্ছেদ ১৪(১)-এর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হয়। অনুচ্ছেদ ১৪(১)-এ "যোগ্য, স্বাধীন ও পড়্গপাতহীন আদালত" কর্তৃক আসামীর বিচার করা হবে এ মর্মে অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।[২]

রোম সংবিধির আওতায় বাদী ও বিবাদী উভয় পড়্গ কোনো বিচারকের প্রত্যাহার চেয়ে আবেদন করতে পারেন। রোম সংবিধির অনুচ্ছেদ ৪১(২)-এর আওতায় বাদী ও বিবাদী উভয় পড়্গকে এ অধিকার দেওয়া হয়েছে।

৩. *যথাযথ প্রক্রিয়া বিষয়ে আসামীর অধিকার*

পড়্গপাতহীন বিচারের আন্তর্জাতিক মানদ-ের সঙ্গে সাযুজ্য রাখার বিষয়টিকে উৎসাহিত করার স্বার্থে আমরা আপনার সরকারকে উপযুক্ত পদড়েপ নিতে আহ্বান করছি, যার ফলে ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়ায় আসামীর অধিকার রড়্গা সুনিশ্চিত হবে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সামনে আসামীর অধিকারসমূহ সুস্পষ্টভাবে উলেস্নখ এসব পদড়েপের একটি গুরম্নত্বপূর্ণ অংশ।

আইসিটি আইনের ধারা-১৭-তে আসামীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধিকার স্বীকার করা হয়েছে, যার মধ্যে আছে আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ক্ষেত্রে তাঁর প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা প্রদানের অধিকার, নিজের সপক্ষে বিবাদীর নিজেকেই উপস্থাপন অথবা অন্য আইনজীবী নির্বাচনের অধিকার, বিচারের সময় সাক্ষ্য উপস্থাপন এবং সাক্ষীকে জেরা করার অধিকার।

সংশিস্নষ্ট আইন ও বিধিসমূহে তদন্ত ও বিচার উভয় পর্যায়ে আরো কিছু সুরক্ষার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন যাতে বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত আইসিসিপিআর-এর অনুচ্ছেদ-১৪-তে উলিস্নখিত বিধানের অনুসরণ নিশ্চিত করা যায়। আসামীর যে গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলো সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন তার মধ্যে রয়েছে:

- *জোরপূর্বক দোষ স্বীকারে বাধ্য না করা। রোম সংবিধির অনুচ্ছেদ-৬৭ অনুযায়ী আসামীর নিরব থাকার অধিকার রয়েছে এবং "এ নিরবতাকে এভাবে বিবেচনা করা চলবে না যে, এর মাধ্যমে দোষী বা নির্দোষ সাব্যস্ত হয়।"*

- *আইনি পরামর্শদাতার সঙ্গে নিভৃতে যোগাযোগের সুযোগ। রোম সংবিধির অনুচ্ছেদ-৬৭ অনুযায়ী বিবাদী পক্ষ "আসামীর নির্বাচিত আইনি পরামর্শদাতার সঙ্গে বিনা বাধায় নিভৃতে যোগাযোগ করতে পারবে।"*

- *বিনা বিলম্বে বিচার পাবেন যা আইসিসিপিআর-এর অনুচ্ছেদ ১৪(১)-এ নিশ্চিত করা হয়েছে।*

- *বিবাদীপক্ষকে কার্যকরভাবে উপস্থাপন করা। এ লক্ষ্যে প্রসিকিউটর তাঁর কাছে অথবা নিয়ন্ত্রণে থাকা যে কোনো সাক্ষ্য বিবাদীপক্ষের কাছে হস্তান্তর করবেন রোম সংবিধির অনুচ্ছেদ ৫৭ অনুযায়ী যা "আসামীর নির্দোষিতা বা তার লঘুকরণ প্রকাশ করে, অথবা আসামীর অপরাধের গুরুত্ব হ্রাস করে, অথবা বাদীপক্ষের সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা হানি করতে পারে।" সত্য যা তার প্রকাশ এবং বিচার প্রক্রিয়ার ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে এটি অতি অবশ্যই করতে হবে। বাদীপক্ষের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ উত্থাপনের বিরুদ্ধেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ সুতরাং আইসিটি আইনের বিধির মধ্যে এটি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। বাদীপক্ষ কর্তৃক আসামীর অনুকূল সাক্ষ্য* (exculpatory evidence) *প্রকাশ করা যুগোসস্নাভিয়া ও রুয়ান্ডার জন্য প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব্যুনাল, সিয়েরা লিয়নের জন্য*

প্রতিষ্ঠিত বিশেষ আদালত ও আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আদালতে পরিচালিত বিচার প্রক্রিয়ার অন্যতম শর্ত ছিল।

- *আসামীপড়্গকে প্রস্তুতি গ্রহণে পর্যাপ্ত সময় প্রদান। এড়্গেত্রে আইসিটি কর্তৃক প্রদত্ত তিন সপ্তাহ সময় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে দেওয়া সময়ের তুলনায় অত্যন্ত কম। এসব আদালতে বিবাদী পড়্গকে বাদীপড়্গের সাড়্গীর সাড়্গ্যের বিস্তারিত বিবরণ ও অন্যান্য সাড়্গ্য হস্তান্তর করার পর সাধারণভাবে কয়েক মাস পর্যন্ত সময় দেওয়া হয় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য।*

- *বিবাদীর ওপর প্রমাণভার (burden of proof) বা খ-নের দায়িত্বভার চাপিয়ে না দেওয়া। আইসিসিপিআর-এর অনুচ্ছেদ ১৪(২)-তে পরিষ্কারভাবে বলা আছে আসামী "যতড়্গণ পর্যন্ত না আইনের চোখে দোষী সাব্যস্ত না হচ্ছেন ততড়্গণ নির্দোষ হিসাবে পরিগণিত" হওয়ার অধিকার রাখবেন। তবে বিধি ৫১-তে আবার অন্যত্রস্থিতির (alibi) দ্বারা আত্মপড়্গ সমর্থনের ড়্গেত্রে প্রমাণভার আবার বিবাদীর ওপর দেওয়া হয়েছে। যুগোসস্নাভিয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত আইসিটি, রস্নয়ান্ডার জন্য প্রতিষ্ঠিত আইসিটি এবং আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আদালতে প্রতিষ্ঠিত অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের সংশিস্নষ্ট আইন ও বিধি সংশোধন করা উচিত যার মাধ্যমে বিবাদীকে নিজের অন্যত্রস্থিতি সম্পর্কে জানানোর সুযোগ দেওয়া হবে এবং যার উত্তর দেওয়ার জন্য বাদীপড়্গ পর্যাপ্ত সুযোগ পাবেন। তবে এড়্গেত্রে প্রমাণভার বাদীপড়্গের ওপরই বর্তাবে।*

- *ne bis in idem নীতি অবলম্বন যার তাৎপর্য একই অপরাধের জন্য দু'বার বিচার না করা। এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় যে, কোনো ব্যক্তি কোনো কাজের জন্য আবার বিচারের সম্মুখীন হবেন না যদি সেই কাজের জন্য অন্য কোনো আদালতে তাঁর শাস্তি হয়ে থাকে বা তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন।*

৪. মৌলিক অধিকার এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৭(ক)

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৭(ক)-এর ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। অনুচ্ছেদ ৪৭(ক)-তে বলা হয়েছে "এই অনুচ্ছেদের বলে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনের আওতায় অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তি অনুচ্ছেদ ৪৭(ক)-কে অসাংবিধানিক হিসাবে চ্যালেঞ্জ করা সহ সংবিধানের আওতায় কোনো প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।"

এ বিধানের বলে একজন অভিযুক্ত বাংলাদেশের আর সব নাগরিককে যে সুরড়্গা দেওয়া হয়েছে তা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এসব সুরড়্গার মধ্যে রয়েছে গ্রেপ্তার ও আটকের বিরম্নদ্ধে সুরড়্গা প্রদানকারী অনুচ্ছেদ ৩৩, বিচার ও শাস্তির ড়োত্রে সুরড়্গা প্রদানকারী বিধান অনুচ্ছেদ ৩৫, এবং মৌলিক অধিকারের সুরড়্গা চেয়ে হাইকোর্টের কাছে আবেদন করার এখতিয়ারসহ মৌলিক অধিকার প্রয়োগের সুরড়্গা প্রদানকারী অনুচ্ছেদ ৪৪ ।[৩] এসব মৌলিক অধিকার বাংলাদেশের সংবিধান এবং আ~ত্মর্জাতিক আইনগুলোতে স্বীকার করা হয়েছে এবং অন্যান্য সকল ফৌজদারী বিচারের ড়োত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের এথেকে বঞ্চিত করা হয়নি। আ~ত্মর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘনের অপারধে যাঁরা অভিযুক্ত তাঁদের ড়োত্রে এ অধিকারগুলো অস্বীকার করার তাই কোনো যৌক্তিকতা নেই। এ অনুচ্ছেদটি বাতিল করা উচিত যেহেতু এ অনুচ্ছেদের ভিত্তিতেই প্রশ্ন তোলা হতে পারে যে আ~ত্মর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনে ন্যায্য বিচারের মানদ-রড়্গা করা হয়নি।

৫. বিবাদী কার্যালয় প্রতিষ্ঠা

"সম অস্ত্র" ন্যায্য বিচারের একটি মৌলিক স্ত~ম্ভ। সম অস্ত্রের তাৎপর্য এই যে এ নীতি প্রত্যেক পড়্গকে নিজের যুক্তিতর্ক উপস্থাপনে পর্যাপ্ত সুযোগ দেয় এবং তা দেয় এমন কতগুলো শর্তের আওতায় যার ফলে কোনো পড়্গ বিশেষ ধরনের সমস্যায় পতিত হয় না।

যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরম্নদ্ধে অপরাধ ও গণহত্যা সংক্রা~ত্ম মামলা সাধারণ খুন বা অন্যান্য ধরনের গুরম্নতর অপরাধ যা দেশের ভেতরে ঘটে থাকে সেসব বিষয়ে মামলা থেকে অনেক বেশী জটিল। এসব জটিল মামলা পরিচালনায় এমনকি অভিজ্ঞ আইনজীবীদেরও প্রয়োজনীয় দড়্গতার ঘাটতি থাকতে পারে, যার ফলে তাঁরা অনেক সময় মক্কেলকে উপযুক্ত সহায়তা দিতে পারেন না। বিশেষ করে এসব অপরাধ সংক্রা~ত্ম আ~ত্মর্জাতিক আইনের দর্শন যা অত্য~ত্ম ব্যাপক ও জটিল সে সম্পর্কে তাঁদের প্রয়োজনীয় রকম জানা না-ও থাকতে পারে। আইসিটি আদালতে কত জনের বিরম্নদ্ধে অভিযোগ আনা হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। এড়োত্রে পৃথিবীর অন্যান্য আদালত যেখানে এসব অপরাধের বিচার হয়েছে সেসব অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশও গুরম্নত্বপূর্ণ শিড়্গা নিতে পারে।

একটি "বিবাদী কার্যালয়" প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া উচিত যেহেতু সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে আসামীর অধিকার রড়্গায় এ ধরনের কার্যালয় গুরম্নত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আ~ত্মর্জাতিক ফৌজদারী আইনের মৌলিক দর্শন ও এসব আইনের প্রাসঙ্গিক

বিবর্তন সম্পর্কে জানতে এ কার্যালয় সাহায্য করতে পারে। তদন্তের কলাকৌশল সম্পর্কেও এ কার্যালয় প্রশিক্ষণ দিতে পারে। সিয়েরা লিয়নের বিশেষ আদালতে বিবাদী কার্যালয়ের প্রধান আদালত প্রশাসন এবং বিচারকদের কাছে আসামীর প্রতিনিধিত্ব ও ন্যায্য বিচার সংক্রান্ত দলিলাদি পেশ করেন। এ কার্যালয়ের আরেকটি কাজ বিবাদীর আইনজীবীরা যাতে মামলার প্রস্তুতি ও উপস্থাপনে পর্যাপ্ত সময় পান তা নিশ্চিত করা। বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় যুদ্ধাপরাধ আদালতেও (বসনীয় ভাষায় যার নামসংক্ষেপ 'ওকেও') আসামীর আইনজীবীদের সহায়তার জন্য একই ধরনের বিবাদী কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

বিবাদী কার্যালয়ে যোগ্য আইনজীবীদের একটি তালিকাও রাখা হয়, যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া যায়, যদি তিনি পছন্দমতো আইনজীবী নিয়োগের সামর্থ্য না রাখেন।

৬. অনুবাদক

বিচার প্রক্রিয়ায় ইংরেজি ও বাংলা প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা হিসাবে গৃহীত হয়েছে। আইসিটি-এর ধারা ১০(৩)-এ বলা হয়েছে আসামীকে একজন অনুবাদক দেওয়া যেতে পারে, যদি তিনি ইংরেজিতে নিজের বক্তব্য প্রকাশে অপারগ হন বা বুঝতে না পারেন। এ ধারাটি সংশোধন করে আসামীকে বিনা খরচে অনুবাদক প্রদান বাধ্যতামূলক করা উচিত যা আইসিসিপিআর-এর ১৪(৩)(চ) অনুচ্ছেদ-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে আসামী "যদি আদালতে ব্যবহৃত ভাষা বুঝতে বা বলতে অপারগ হন তবে তাঁকে বিনা খরচে অনুবাদক দেওয়া হবে।"

৭. ফৌজদারি অপরাধের দায়দায়িত্ব বহির্ভূত বা এখতিয়ার বহির্ভূত হওয়ার ভিত্তি

আন্তর্জাতিক চর্চার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনে আসামীর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমরা আপনার সরকারকে আহ্বান জানাই। রোম সংবিধির অনুচ্ছেদ ৩১ অনুযায়ী ফৌজদারী অপরাধের দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়ার ভিত্তির মধ্যে মানসিক সামর্থ্য, যৌক্তিক ও আনুপাতিক আত্মপক্ষ সমর্থন, এবং আসন্ন জীবননাশ বা গুরুতর দৈহিক ক্ষতির হুমকির মুখোমুখি হয়ে কোনো কাজ করতে বাধ্য হওয়া অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

রোম সংবিধির অনুচ্ছেদ ২৬-এ বলা হয়েছে, "উক্ত আদালতের কোনো ব্যক্তির বিচারের এখতিয়ার থাকবে না যদি অপরাধ সংঘটনকালে ঐ ব্যক্তির বয়স ১৮ বছরের নিচে হয়ে থাকে।" আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল) আইনেও একই ধরনের শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

৮. সাক্ষী ও আক্রান্ত ব্যক্তির সুরক্ষা

আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন এবং এর বিধিসমূহে উপযুক্ত সংশোধনী আনা প্রয়োজন যার মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তি ও সাক্ষী যাঁরা আদালতের সামনে উপস্থিত হবেন তাঁদের নিরাপত্তা, মর্যাদা, গোপনীয়তা এবং দৈহিক ও মানসিক কল্যাণ নিশ্চিত করা যায়। এ দায়বদ্ধতা রোম সংবিধিতেও স্বীকার করা হয়েছে, যার আওতায় সাক্ষীরা বাদীপক্ষ বা আসামী পক্ষ যে পক্ষেরই হোন তাঁদের সকলের এবং সব আক্রান্ত ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

আদালত কার্যক্রমের অত্যন্ত জরুরি একটি দিক বিচার চলাকালীন আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার কারণে সাক্ষী ও অন্যান্য যাঁরা ঝুঁকির মুখে পড়বেন, তাঁদের সকলের জন্য সুরক্ষা ও সহায়তা নিশ্চিত করা। আদালতে সাক্ষীদের উপস্থিতি ও নিরাপত্তা নির্ভর করবে তাঁদের সুরক্ষা প্রদান এবং তাঁদের সঙ্গে মর্যাদার সঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা তার ওপর। এ ধরনের অপরাধ বিচারের জন্য গঠিত অন্যান্য ট্রাইব্যুনালের অভিজ্ঞতা থেকে এটি জোর দিয়ে বলা যায় যে আদালত প্রশাসনের ভেতরে পর্যাপ্ত শক্তিশালী একটি সাক্ষী ও আক্রান্ত ব্যক্তি সুরক্ষা ইউনিট গঠিত হলে তা আদালতের কর্মকা- সফলভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে। এ ধরনের একটি ইউনিটের কম করে হলেও যে সামর্থ্যগুলো থাকতে হবে তা হলো সাক্ষী, আক্রান্ত ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের আদালতে উপস্থিতির সময় ও পরবর্তীকালে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে, তাঁদের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং আদালতে যাওয়া-আসার জন্য নিরাপদ পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরনের ইউনিটের আরো যে দক্ষতা থাকা দরকার তা হলো নিরাপত্তার স্বার্থে দেশের ভেতরে অথবা বিপদের আশঙ্কা খুব বেশি হলে দেশের বাইরে কখন স্থানান্তরিত করতে হবে তা বুঝতে পারা এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

সাক্ষীদের জানাতে হবে তাঁদের কী কী অধিকার রয়েছে এবং আদালতের ভেতরে ও বাইরে কী ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থা তাঁদের জন্য নেওয়া হয়েছে। আইসিটি আইন ও বিধিসমূহে সুস্পষ্ট সংশোধনী আনা প্রয়োজন যার মাধ্যমে সাক্ষীদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ উৎসাহিত করবে। এর ফলে সাক্ষীরাও স্বপ্রণোদিত হয়ে সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসবেন, যা মামলাগুলোকে আরো শক্তিশালী করবে।

একইসঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকারও নিশ্চিত করা জরুরি। যদি সাক্ষীদের এ অধিকার দেওয়া হয় যে তাঁরা আসামীদের কাছে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ না করে সাক্ষ্য দিতে পারবেন, তবে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একজন সাক্ষী এ অধিকার পাবেন তা সুস্পষ্টভাবে ও গভীর বিবেচনার সঙ্গে নির্ধারণ করতে হবে, যাতে এর ফলে অভিযুক্তের ন্যায্য বিচার পাওয়ার অধিকার কোনোভাবে ব্যাহত না হয়।

৯. অন্তবর্তী আপীল

সংশিস্নষ্ট বিধিসমূহে বলা হয়েছে অভিযুক্ত আইনগত বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে আবেদন করতে পারবেন কেবলমাত্র আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর। কিন্তু দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগেই বিচার চলাকালীন জরুরি কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে যে কোনো পক্ষের আবেদন করার অধিকার ন্যায্য বিচার প্রক্রিয়ার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক।

আন্তর্জাতিক আদালতগুলোতে বিবাদী ও বাদী উভয় পক্ষকে বিচার প্রক্রিয়া বিষয়ে উচ্চ আদালতের আপীল বিভাগে আবেদন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র বিচার শেষ হওয়ার পরই আপীল আদালত যিনি সাধারণত বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত নন সেখানে আবেদন করা যাবে এ মর্মে বিধি শুধুমাত্র চূড়ান্ত রায় প্রদানের বিষয়টিকে প্রলম্বিতই করবে। এছাড়া বিচার প্রক্রিয়া আদৌ নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা এক্ষেত্রে সে প্রশ্নও উঠতে পারে।

একটি আপীল চেম্বার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন যেখানে আইসিটি-এর বিবাদী ও বাদী পক্ষের অন্তবর্তী আবেদনই কেবল বিবেচনা করা হবে। এ ধরনের চেম্বার প্রতিষ্ঠার ফলে বিচার প্রক্রিয়া প্রলম্বিত হওয়ার যে উদ্বেগ সাধারণভাবে রয়েছে তার উল্টোটিই এখানে ঘটবে। এ ধরনের আপীল বেঞ্চ পুরো প্রক্রিয়াটিকে বেগবান হতে সাহায্য করবে কারণ ট্রাইব্যুনাল ত্রম্নটিপূর্ণ বিচার করেছে আপীল আদালত এমন কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছালে সে বিচার পুনরায় অনুষ্ঠিত করতে হবে। অন্তবর্তী আপীলের মাধ্যমে সে ত্রম্নটি যদি আগেই শোধরানো যায় তবে আবার বিচার অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা অনেকটা কমে যাবে।

১০. আটককৃত ব্যক্তির সঙ্গে আচরণ

বিধি ১৬(২)-এ বলা হয়েছে, "এ আইনের আওতায় তদন্ত চলাকালে কোনো ব্যক্তির ওপর কোনোরকম জোর ও চাপ প্রয়োগ বা হুমকি প্রদান করা চলবে না।" সন্তোষের বিষয় আইনটির এ বিধান বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঘোষণা (Convention against

Torture - CAT)-*এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সিএটি নির্যাতনকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে, "কোনো ব্যক্তি অথবা তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য বা স্বীকারোক্তি আদায়, ঐ ব্যক্তি বা তৃতীয় পড়্গা কর্তৃক সম্পাদিত কোনো কাজের জন্য ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে ঐ ব্যক্তির ওপর প্রচ- দৈহিক বা মানসিক পীড়া বা দুর্ভোগ চাপিয়ে দেওয়া...তাঁকে বা তৃতীয় ব্যক্তিকে ভয় দেখানো বা জোর করা, অথবা এমন কোনো কারণে কোনো ধরনের বৈষম্য যার ভিত্তি," এবং যা করা হয় কোনো সরকারি কমকর্তার অনুমোদন বা মৌন সম্মতিতে।*

বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর যেহেতু নির্যাতন করে এবং জোরপূর্বক ও চাপ প্রয়োগ করে সন্দেহভাজন ব্যক্তির কাছ থেকে অপরাধ বিষয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের লম্বা ইতিহাস আছে, সেহেতু আমরা এ আইনের বিধিসমূহ সংস্কারের জন্য আহ্বান করছি, যাতে এমন একটি প্রক্রিয়া চালু করা যায় যার মাধ্যমে আদালত নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের অভিযোগ বিবেচনায় নিতে পারেন এবং উপযুক্ত সমাধান দিতে পারেন। নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের সব অভিযোগ দ্রুত ও স্বচ্ছতার সঙ্গে তদন্ত করার বিষয়টি আইসিটি-এর বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে সংসদে নির্যাতন সংক্রান্ত যে খসড়া আইনটি উপস্থাপিত হয়েছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তার প্রতি জোর সমর্থন ব্যক্ত করছে। আইনটি পাশ হলে এবং আইসিটিতে তার প্রয়োগ করা হলে তা নির্যাতন বন্ধে সরকারের জোর প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরবে।

১১. *জটিল অপরাধ তদন্ত, অভিযোগ শুনানি ও বিচার প্রক্রিয়া সম্পাদনে সামর্থ্য বৃদ্ধি*

অভিযোগ শুনানি এবং বিচারিক প্রক্রিয়ার আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত প্রায়োগিক দড়্গতা থাকতে হবে যাতে আইনগতভাবে প্রাপ্ত পর্যাপ্ত সাড়্গ্যের ওপর ভিত্তি করে মামলা উপস্থাপন ও রায় প্রদান করা হয়। আমাদের উদ্বেগ এই যে গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচারে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা সীমিত হওয়ার ফলে এখানকার প্রসিকিউটর এবং বিচারকদের এ ধরনের জটিল মামলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিড়্গণ ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি রয়েছে। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে সম্পন্ন অন্যান্য ফৌজদারী আদালতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় মানবাধিকার গণলঙ্ঘনের মূল হোতাদের বিরুদ্ধে সফলভাবে মামলা গঠনের বিষয়টি সাধারণ ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা গঠন ও রায় নির্ণয়ের

*চেয়ে অনেক বেশি জটিল এবং এর জন্য বিশেষায়িত জ্ঞান ও দড়্গতার প্রয়োজন হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, প্রসিকিউটর এবং বিচারক উভয়ের প্রাসঙ্গিক অপরাধের উপাদান (*elements of crimes*), প্রাসঙ্গিক আইনের দর্শন (*jurisprudence*) এবং ঐ অপরাধের দায়দায়িত্বের বিভিন্ন ধরন (*modes of liablity*) সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে, যাতে যে অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে তার সপড়্গে যথেষ্ট সাড়্গ্য উপস্থাপন করা যায়। প্রামাণ্য অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগ গঠন ও বিচার কাজ সম্পাদনে দড়্গতা (রাজনৈতিক ও সামরিক কাঠামো বিশেস্নষণে প্রয়োজনীয় দড়্গতা যার অন্ত্মর্ভুক্ত) এবং সাড়্গীর সাড়্গ্যও অত্যন্ত্ম গুরন্ত্মত্বপূর্ণ বিশেষ করে যেখানে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের বিচারের বিষয়টি জড়িত।*

আইসিটিতে অভিযোগ শুনানি ও মামলাগুলোর বিচার আরো বেশি জটিল হয়ে পড়েছে কেননা যে অপরাধের বিচার এখানে করা হচ্ছে সেগুলো করা হয়েছিল দীর্ঘ চার দশক আগে। আমরা তাই আপনার সরকারকে এই আদালতের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রসিকিউটর ও বিচারকদের উপযুক্ত রকমের দড়্গ করে তোলার জন্য আহ্বান করছি। আমাদের এ সংক্রান্ত্ম সুপারিশের মধ্যে রয়েছে প্রায়োগিক কৌশলের বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মাধমে নিয়মিত প্রশিড়্গণ আয়োজন এবং অন্যান্য চলতি সহায়তাগুলো দিয়ে যাওয়া যাতে মামলাগুলোকে যতটা সম্ভব জোরদারভাবে উপস্থাপন করা যায় এবং বিচারকার্য আন্ত্মর্জাতিক মানদ- এবং অনুশীলনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিচালনা করা যায়।

১২. মৃত্যুদ-

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ মৃত্যুদ- সমর্থন করে না। আমরা বিশ্বাস করি, যে কোনো পরিস্থিতিতে মৃত্যুদ- মর্মগতভাবে নিষ্ঠুর একটি দ- এবং এর মধ্যে দিয়ে মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় অতএব আমরা এ দ-ের বিলোপ চাই। আন্ত্মর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনের ২১(২) ধারায় মৃত্যুদ- প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে। আন্ত্মর্জাতিক ফৌজদারী আদালত, রন্ত্ময়ান্ডার জন্য প্রতিষ্ঠিত আন্ত্মর্জাতিক ফৌজদারী ট্রাইব্যুনাল এবং সাবেক যুগোসস্নাভিয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত আন্ত্মর্জাতিক ফৌজদারী আদালতে সর্ব্বোচ্চ শাস্ত্মি হিসাবে যাবজ্জীবন কারাদ- দেওয়া হয়েছে। ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত্মের মাধ্যমে মৃত্যুদ- কার্যকর করাকে বিলম্বিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে প্রাণদ-ের বিলোপ সাধন যার চূড়ান্ত্ম লড়্গ্য।

---

[১] *নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে আন্ত্মর্জাতিক চুক্তি (আইসিসিপিআর)-এর অনুচ্ছেদ-১৫-এ বলা হয়েছে: "১. কোনো ব্যক্তিকে এমন কোনো কাজ বা কাজের গাফিলতি থেকে*

উদ্ভূত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত্ম করা যাবে না যে কাজ বা কাজের গাফিলতি সংঘটনকালে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইনে অপরাধ হিসাবে পরিগণিত ছিল না। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধ সংঘটনকালে ঐ অপরাধের যে শাস্তি ছিল তার চেয়ে বেশি গুরম্নতর শাস্তি প্রদান করা হবে না। যদি অপরাধ সংঘটনের পরে ঐ অপরাধের জন্য আগের চেয়ে লঘু শাস্তির বিধান করা হয় তবে অভিযুক্ত তা থেকে লাভবান হবেন। ২. এ অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই কোনো ব্যক্তির বিচার করা এবং শাস্তি প্রদানে বাধা দিতে পারবে না যদি তিনি এমন কোনো কাজ করেন বা কাজে গাফিলতি করেন যা সংঘটনকালে জাতিসমূহের গোষ্ঠী দ্বারা স্বীকৃত আইনের সাধারণ নীতিমালার নিরিখে অপরাধ হিসাবে পরিগণিত ছিল।"

[২] *(আইসিসিপিআর)-এর অনুচ্ছেদ-১৪(১)-এ বলা হয়েছে: আদালত ও ট্রাইব্যুনালের কাছে সকল ব্যক্তি সমান বলে গণ্য হবেন। তাঁর বিরম্নদ্ধে কোনো অপরাধমূলক অভিযোগ বিষয়ে অথবা কোনো আইনি মামলায় তাঁর অধিকার ও দায়বদ্ধতা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ড়্গেত্রে প্রত্যেকে আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত একটি যোগ্য, স্বাধীন ও নিরপেড়্গ ট্রাইব্যুনালে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও উন্মুক্ত শুনানির মাধ্যমে বিচারের অধিকার পাবেন।*

[৩] *বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৭(ক)।*